চতুর্থ অধ্যায়

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়

Business Based on Ownership

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি ব্যবসায় হলো প্রধানত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। ভোক্তাদের বিভিন্নমুখী চাহিদা, মালিকানা, ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মনোভাব ও আকার ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠনের সৃষ্টি হয়। আমরা এ অধ্যায়ে মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন এবং এগুলোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও আইনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- একমালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ ও জনপ্রিয়তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ও এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অংশীদারদের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারব;
- অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারব;
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমবায় সমিতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমবায় সমিতির গঠন ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বর্ণনা করতে পারব।

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (Different Types of Business on the Basis of Ownership)

মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের জন্য যুগে যুগে মালিকানা ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে উঠেছে। মুনাফা অর্জনের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল থাকলেও প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আওতা, আয়তন ও কার্যক্ষেত্রের ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

১. একমালিকানা ব্যবসায়
২. অংশীদারি ব্যবসায়
৩. যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন
৪. সমবায় সমিতি
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Sole Proprietorship Business)

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একক মালিকানায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ জন্য এটিকে সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন যোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায় গঠন অত্যন্ত সহজ। যে কোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় কারবার শুরু করতে পারেন। সাধারণত এ জাতীয় ব্যবসায়ের আয়তন ছোট হয়। তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজার বা রাস্তার পাশে কিংবা নিজ বাড়িতে যে কেউ ছোট-খাটো ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে শহরে বা পৌরসভা এলাকায় উদ্যোক্তাকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসায় আরম্ভ করতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসায় সংগঠন একমালিকানার ভিত্তিতে গঠিত। শুধু তাই নয় ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ৮০% ব্যবসায় এক মালিকানাভিত্তিক। আমাদের দেশের সাধারণ মুদি দোকান, চায়ের দোকান, সবজি দোকান, অধিকাংশ খুচরা দোকান একক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sole Proprietorship Business)

একমালিকানা ব্যবসায় হলো এমন এক ধরনের ব্যবসায় যার উদ্যোক্তা, মালিক, পরিচালক ও অর্থের যোগানদাতা একই ব্যক্তি এবং তিনি নিজেই এককভাবে ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি, দায়, লাভ ও লোকসান বহন করেন। নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো–

- একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক সব সময় একজন ব্যক্তি যিনি নিজ উদ্যোগে পুঁজির সংস্থান করেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন ও ঝুঁকি বহন করেন ।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের গঠন বেশ সহজ। আইনগত ঝামেলা না থাকায় যে কেউ ইচ্ছা করলে ও উদ্যোগ নিলে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারেন।

- স্বল্প মূলধন নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করা যায়। মালিক নিজেই এ মূলধন জোগান দেন। সাধারণত নিজস্ব সঞ্চয় ও প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমালিকানা ব্যবসায় ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। মূলধনের স্বল্পতা ও একজন ব্যক্তির মালিকানার জন্য এর আয়তন সাধারণত ছোট হয়ে থাকে।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়।
- আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের পৃথক কোনো সত্তা নেই। মালিক ও ব্যবসায় অভিন্ন।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব মালিকের। ফলে তার দায় অসীম। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ করতে হয়।
- পুরো ব্যবসায়ের একক মালিকানার জন্য লাভের সবটা মালিক একা ভোগ করেন। আবার লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিককেই এককভাগে তা বহন করতে হয়।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারণ ব্যবসায় চালু রাখা বা বন্ধ করা মালিকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

কর্মপত্র-১ : একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে এ ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করো

একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ	একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ (Suitable Areas for Sole-proprietorship Business)

একমালিকানা ব্যবসায় প্রাচীনতম ব্যবসায় হিসেবে বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত সকল দেশেই স্বীকৃত। প্রাচীনতম ব্যবসায় হলেও বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় হিসেবে টিকে আছে। একমালিকানা ব্যবসায়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে যে কারণে এ জাতীয় ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয়। একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. অনেকে আছেন, যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই ; অথচ ব্যবসায় শুরু করতে আগ্রহী। আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী এমন হাজার হাজার লোকের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে উপযুক্ত। যেমন- চায়ের দোকান, ছোট খাবারের দোকান, কুটির শিল্পের দোকান, মৃৎ শিল্পের দোকান।

২. এমন কিছু ব্যবসায়, আছে যেগুলোর জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। সে জাতীয় ব্যবসায়ের জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে বেশি উপযোগী বিবেচিত হয়। যেমন- পানের দোকান, সবজির দোকান।

৩. যে সকল ব্যবসায়ে ঝুঁকি একেবারেই কম সেগুলোর জন্য একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। কেননা কম আয়ের ব্যক্তিরা সাধারণত ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চান, ফলে তারা এমন ব্যবসায়ই বেশি পছন্দ করেন। যেমন- চালের দোকান, ঔষধের দোকান।

৪. কিছু কিছু ব্যবসায় আছে, যেগুলোর প্রদত্ত পণ্য বা সেবার চাহিদা বিশেষ বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট সীমাবদ্ধ। সে সব পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন- স্কুলের সামনে বইখাতার দোকান, কোনো শিল্পকারখানার সামনে রেস্টুরেন্ট।

৫. পচনশীল জাতীয় পণ্য যেমনঃ ফল-মূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদির ব্যবসায় সাধারণত একমালিকানা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৬. ডাক্তারি, প্রকৌশল ও আইন ব্যবসায়ের মতো ক্ষুদ্র আকারের পেশাভিত্তিক ব্যবসায় এবং প্রত্যক্ষ সেবাধর্মী ব্যবসায় যেমনঃ লন্ড্রি, সেলুন, বিউটি পার্লার ইত্যাদি সাধারণত একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৭. অনেক পণ্য আছে যেগুলোর চাহিদা ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল রুচি, আগ্রহ ও ফ্যাশনের উপর নির্ভরশীল। সে সকল পণ্যের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন-দরজির দোকান।

৮. যেসব ব্যবসায় প্রদত্ত পণ্য দ্রব্য ও সেবার সাথে ব্যক্তির বা মালিকের নৈপুণ্য, শিল্পকর্ম ও সুনাম জড়িত থাকে সেগুলোর জন্য একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন- চিত্রকর্মের দোকান, ছবি তোলার দোকান, স্বর্ণকারের দোকান, ফার্নিচারের দোকান, মিষ্টির দোকান।

৯. কৃষিজাত পণ্য ও সহায়ক পণ্যের ব্যবসার জন্যও একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন- ধান ব্যবসায়, আলু ব্যবসায় ও কাঁচামালের ব্যবসায়।

১০. স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের বই, খাতা-পত্র, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশনা ব্যবসায়ের জন্য একক মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, স্বাধীনচেতা মনোভাব, স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প শ্রম বিনিয়োগ করে একমালিকানা ব্যবসায় যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে শুরু করা যায়। এ ব্যবসায় আইনি জটিলতামুক্ত এবং এতে ঝুঁকিও কম। অন্যদিকে একমালিকানা ব্যবসায় ভোক্তাদের অত্যন্ত নিকটে থেকে তাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী পণ্য বা সেবা প্রদান করতে পারে। ফলে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, তেমনি সকলের নিকট এ ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তাও বেশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনায় একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যার কারণে বাংলাদেশের বর্তমান মোট ব্যবসায় সংগঠনের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে দেশে বিরাজমান বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে যুবসমাজকে একমালিকানা ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করতে ঋণ পাওয়া সহজ করাসহ আরো সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

কর্মপত্র-২ : একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে এর জনপ্রিয়তার কারণগুলো খুঁজে বের করো

একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Partnership Business)

ব্যবসায় জগতে একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় হলেও একক মালিকের মূলধনের স্বল্পতা, অসীম দায়, ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র আওতা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবসায়ের পরিধি আরও বৃদ্ধি ও ঝুঁকি কমিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে একাধিক ব্যক্তি মিলে নিজেদের পুঁজি ও সামর্থ্য একত্রিত করে যে নতুন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠে, তাকেই অংশীদারি ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়। মূলত একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো দূর করার প্রয়োজনেই অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। তবে অংশীদারি ব্যবসায়ে কিছু কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। বিশেষ করে মুনাফা বণ্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব ও কর্ম বিভাজন, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে অংশীদারি চুক্তিপত্র ও অংশীদারি আইন প্রণয়ন করতে হয়। বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায় '১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন' দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে অংশীদারি চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। একের অধিক বলতে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন অংশীদারকে বোঝায়। তবে অংশীদারি ব্যবসায়টি যদি ব্যাংকিং ব্যবসায় হয় তখন সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০-এর বেশি হবে না। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ নং ধারা মতে, 'সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত' ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। যারা এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে 'অংশীদার' এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন (Formation of Partnership Business)

আমরা জেনেছি যে, অংশীদারি ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত এক ধরনের ব্যবসায়, যেখানে তারা সকলে অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন সবার পক্ষে উক্ত ব্যবসায়টি পরিচালিত করে থাকে। একমালিকানার মতো অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনও

অনেক সহজ। এর গঠনেও আইনগত জটিলতা নেই। চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে চুক্তি লিখিত হবার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে চুক্তি ও নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তাই মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতেও ব্যবসায় পরিচালিত হতে পারে। তবে অংশীদারদের মধ্যে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, বিরোধ এবং মামলা এড়ানোর জন্য চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়া যৌক্তিক। এজন্য চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করার জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Partnership Business)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অংশীদারি ব্যবসায় একমালিকানা ব্যবসায়ের মতোই প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন। তবে একমালিকানা ব্যবসায়ের কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করার প্রয়োজনে অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে এ ব্যবসায়ের কিছু কিছু মিল থাকলেও অংশীদারি ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো একে একমালিকানা ও অন্যান্য যৌথ উদ্যোগী ব্যবসায় থেকে আলাদা করেছে। নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. আইনগত ঝামেলা না থাকায় অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনও বেশ সহজ। চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য একাধিক ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। একাধিক ব্যক্তি বলতে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জনকে বোঝায়। ব্যবসায়টি যদি ব্যাংকিং-সংক্রান্ত হয় তখন সদস্য সংখ্যা ১০ জনের বেশি হতে পারবে না।

২. অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ চুক্তি হতে পারে মৌখিক বা লিখিত, নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত।

৩. এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ চুক্তিতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মূলধন সরবরাহ করে থাকে। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানও চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হয়। চুক্তিতে কিছু উল্লেখ না থাকলে সমান হারে লাভ-লোকসান বণ্টিত হবে। আবার চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে কেউ মূলধন না দিয়েও অংশীদার হতে পারে। তবে প্রত্যেক অংশীদারের দায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে অসীম। অর্থাৎ কোনো দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদ যথেষ্ট না হলে অংশীদারগণের ব্যক্তিগত সম্পদ সেজন্য দায়বদ্ধ থাকে। কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলেও তার দায় অবশিষ্ট অংশীদারগণকে বহন করতে হয়।

৪. পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এ ব্যবসায় গড়ে ওঠে এবং এ ব্যবসায়ের সফলতা এর উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অংশীদারগণের মধ্যে আস্থাহীনতা, বিশ্বাসের অভাব ও বিরোধ দেখা দিলে ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে।

৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়, তবে যে সকল অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হয়, সেগুলো অনিবন্ধিত ব্যবসায় থেকে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা ভোগ করে থাকে। নিবন্ধিত হলেও এ ব্যবসায়ে কোনো আইনগত সত্তার সৃষ্টি হয় না। ফলে ব্যবসায় নিজস্ব নামে পরিচালিত হতে পারে না। ব্যবসায়ের সকল লেনদেনও অংশীদারদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে হয়েছে বলে ধরা হয়। পৃথক আইনগত সত্তা না থাকায় এ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অংশীদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

কর্মপত্র- ৩ : অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে উক্ত ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বের করো	
অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা/ সবল দিক	অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা/ দুর্বল দিক
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র (Deed of Partnership Business)

দুই বা ততোধিক ব্যাক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, লিখিত, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত হতে পারে।

একমালিকানা ব্যবসায়ের কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করার প্রয়োজনে অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে এ ব্যবসায়ের কিছু মিল থাকলেও অংশীদারী ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো একমালিকানা ও অন্যান্য যৌথ উদ্যোগী ব্যবসায় থেকে আলাদা করেছে। ১৯৩২ সালের চুক্তি আইনের ৫ ধারা মতে "অংশীদারি সম্পর্ক চুক্তি হতে জন্ম লাভ করে; সামাজিক মর্যাদা বলে নয়।" চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেই অংশীদারী চুক্তিপত্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অংশীদারি চুক্তি হলো এমন একটি দলিল যাতে উক্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধিতি, অংশীদারিদের প্রত্যেকের অবস্থান, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার এবং ভবিষ্যতে বিরোধ মীমাংসা করার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। চুক্তিপত্র সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, চুক্তি ছাড়া মুনাফা অর্জন ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করলেও তা অংশীদারি ব্যবসায় বলে বিবেচিত হবে না। যেমন- পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা যদি তার অংশীদারি ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হন এবং নিজেরা উক্ত ব্যবসায় পরিচালনা করেন ও অর্জিত মুনাফা বণ্টন করে নেন, তাহলেও এটি অংশীদারি ব্যবসায় বলে গণ্য হবে না, যদি তাদের মধ্যে কোনো চুক্তি না থাকে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Deed of Partnership Business)

চুক্তিপত্র অংশীদারি ব্যবসায়ের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যে যাতে কোনো

বিভেদ বা মতবিরোধ সৃষ্টি না হয় এবং ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো জটিলতা না ঘটে সেজন্য চুক্তিপত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকে। সাধারণত চুক্তিপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে :

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম ও ঠিকানা
২. ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আওতা
৩. ব্যবসায়ের কার্যকাল বা স্থায়িত্ব
৪. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
৫. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ
৬. প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি
৭. ব্যবসায় পরিচালনার নিয়মাবলি
৮. যে সকল অংশীদার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন তাদের পরিচিতি
৯. ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি
১০. অংশীদারদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার
১১. যে ব্যাংকে হিসেব খোলা হবে তার নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন
১২. ব্যাংকের হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণের নাম
১৩. নতুন অংশীদার গ্রহণ ও পুরাতন অংশীদারের বিদায়ের নিয়মাবলি
১৪. অংশীদারের মৃত্যুতে তার অংশ নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিশোধ পদ্ধতি
১৫. অংশীদারদের অবসরগ্রহণ ও বহিষ্কারের পদ্ধতি
১৬. ভবিষ্যতে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা পদ্ধতি
১৭. বিলোপসাধনের পদ্ধতি

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন (Registration of Partnership Business)

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধক অফিসে ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্তকরণকে বোঝায়। বাংলাদেশের অংশীদারি আইনে ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় থেকে নিবন্ধিত ব্যবসায়গুলো বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের যেকোনো অংশীদারই অপর কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে যা অনিবন্ধিত ব্যবসায় পারে না। নিবন্ধিত না হলে চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য অপর কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারে না। অন্যদিকে তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, শুধু অনিবন্ধিত হবার কারণে বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা পাওনা দাবি করতে পারে না। তাছাড়া অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না। সুতরাং বলা যায় নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় যেহেতু অনিবন্ধিত ব্যবসায় থেকে কিছু বেশি সুবিধা ভোগ করে, সেহেতু অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন করাটাই বেশি যৌক্তিক। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করার জন্য আবেদনপত্রের সাথে যে সকল বিষয় উল্লেখ করতে হয় সেগুলো হলো–

- অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম
- প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা
- শাখা কার্যালয় থাকলে সেগুলোর ঠিকানা
- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য
- ব্যবসায় শুরুর তারিখ
- ব্যবসায় মোট কার্যকাল বা স্থায়িত্ব কাল
- অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
- অংশীদার হিসেবে ব্যবসায়ে যোগদানের তারিখ

সকল অংশীদারের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্রটি নিবন্ধন অফিসে জমা দিলে নিবন্ধক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। উপরোক্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করবেন এবং পত্র দ্বারা তা জানিয়ে দেবেন। পত্র প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হয়।

কর্মপত্র–৪ : অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেগুলো চিহ্নিত করো
১. ২. ৩. ৪.

অংশীদারের প্রকারভেদ (Classification of Partners)

অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণ ব্যবসায়ের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিবেচনা করে পছন্দমতো অংশীদার হতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার অংশীদারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

বিভিন্ন প্রকার অংশীদার	ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
সাধারণ অংশীদার (Ordinary Partner)	• অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। • অংশীদারদের দায় অসীম। • চুক্তি অনুযায়ী লাভ বা ক্ষতির অংশ পায়। • চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক পায়।
ঘুমন্ত অংশীদার (Sleeping Partner)	• অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। • চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায়। • অধিকার থাকা সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। • অংশীদারদের দায় অসীম। • ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ নয়।

নামমাত্র অংশীদার (Nominal Partner)	• অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না। • ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। • চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিজের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়। • অংশীদারদের দায় সাধারণ অংশীদারদের মতো অসীম নয়। • তবে কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি তাকে অংশীদার মনে করে ঋণ দেয় এবং তা প্রমাণ করতে পারে তাহলে সে ঋণের জন্য সাধারণ অংশীদারের ন্যায় দায়বদ্ধ।
আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার (Quasi Partner)	• এ জাতীয় অংশীদারগণ ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও মূলধন উত্তোলন না করে তা ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ে জমা রাখে। • প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ের পাওনাদার। • তবে কোনো সাধারণ অংশীদার গণবিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ব্যবসায়ে এভাবে থেকে গেলে ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী হবে।
সীমিত অংশীদার (Limited Partner)	• চুক্তি অনুযায়ী কোনো অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ হলে বা আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারের সম্মতিতে কোনো নাবালককে সুবিধা প্রদানের জন্য অংশীদার করা হলে তাকে সীমিত অংশীদার বলা হয়। • অংশীদারদের দায় ব্যবসায়ে নিয়েজিত মূলধনের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। • ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। • চুক্তি অনুযায়ী কোনো নাবালক ব্যক্তিও এরূপ অংশীদার হতে পারে।
আচরণে অনুমিত অংশীদার (Partner by holding out)	• কোনো ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা অন্য কোনো আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেন, তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলা হয়। • যদি কেউ তার আচরণে প্রভাবিত হয়ে ঋণ দেয় বা চুক্তি করে তাহলে সে অংশীদার দায়ী থাকবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন (Dissolution of Partnership Business)

অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপ সাধনই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন। অংশীদারি আইনের বিধান অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি হতে পারে:

১. **সকলে একমত হয়ে বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪০ নং ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে এ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন হতে পারে।

২. **বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে নিম্নোক্ত দুটি কারণে বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন হতে পারে–

ক. একজন ব্যতীত সকল অংশীদার অথবা সকল অংশীদার ব্যতীত একজন দেউলিয়া বলে বিবেচিত হলে; কিংবা

খ. কোনো কার্য দ্বারা ব্যবসায়টি আইন বিরুদ্ধ বা অবৈধ হয়ে পড়লে।

৩. **বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারি চুক্তিতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত যেকোনো কারণে বিলোপ সাধন হতে পারে-

ক. ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে;

খ. ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে;

গ. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে;

ঘ. আদালত কর্তৃক কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

৪. **বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অন্য অংশীদারের কাছে ব্যবসায় বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এ ধরনের ব্যবসায়ের বিলুপ্তি হয়।

৬. **আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিম্নোক্ত যেকোনো কারণে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে-

ক. কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

খ. কোনো অংশীদার দায়িত্ব পালনে চিরতরে অসমর্থ হলে;

গ. কোনো অংশীদারের অসদাচরণের জন্য অংশীদারদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে;

ঘ. কোনো অংশীদার তার প্রাপ্য অংশ তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করলে;

ঙ. ব্যবসায়ে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে এবং লোকসান ব্যতীত ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হলে;

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও অন্য যেকোনো যুক্তিসংগত কারণে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তির নির্দেশ দিতে পারেন।

যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Joint Stock Companies)

একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে ব্যবসায়ের যে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল কালক্রমে তা আর একমালিকানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একমালিকানা ব্যবসায়ের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে মূলধনের স্বল্পতা ও একক পরিচালনা ও ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায়ও মূলধনের সীমাবদ্ধতা, আইনগত সীমাবদ্ধতা, স্থায়িত্বহীনতা ও অসীম দায়ের ভার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এক সময় মানুষের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসায়ের আওতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আইনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় অধিক মূলধন ও বৃহদায়তনের যৌথমূলধনি ব্যবসায় যা কোম্পানি সংগঠন নামেও পরিচিত। মূলত শিল্প বিপ্লবের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার সাথে সাথে ব্যবসায় সংগঠনের প্রকৃতি ও আওতায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থা পারিবারিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে কারখানাতে স্থান নেয়। ফলে জন্ম হয় অধিক মূলধন, সীমিত দায়, যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং আইনগত সত্তা ও পৃথক অস্তিত্ব বিশিষ্ট যৌথমূলধনি ব্যবসায় সংগঠনের। উল্লেখ্য, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৭৫০-১৮৫০) সময়ে ইউরোপের কৃষিতে, শিল্পকারখানায়, কয়লা উত্তোলনে ও পরিবহন ব্যবস্থায় যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে অভিহিত করা হয়।

যৌথমূলধনি ব্যবসায় আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়। সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় ব্রিটেনে ১৮৪৪ সালে যা 'The Joint stock Company Act 1844' নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় ১৮৫০ সালে। ১৯১৩ সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন আবার নতুন করে পাস হয়। স্বাধীন বাংলাদেশেও অনেক বছর যাবৎ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন চালু ছিল। কোম্পানি আইনের ব্যাপক সংস্কার করে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে নতুন কোম্পানি আইন প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল কোম্পানি ব্যবসায় ১৯৯৪ সালের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে কোম্পানি বলতে 'অত্র আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি অথবা বিদ্যমান কোনো কোম্পানিকে বোঝায়'। মূলত কোম্পানি সংগঠন হলো আইন দ্বারা সৃষ্ট, পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন, কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এবং সীমিত দায়ের এমন এক ধরনের প্রতিষ্ঠান, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।

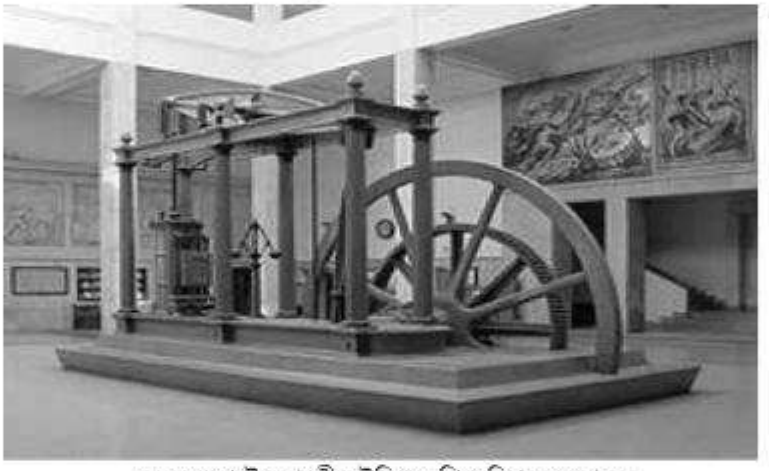

জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন : শিল্প বিপ্লবের স্মারক

যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Features of Joint Stock Company)

বর্তমানের বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে এ জাতীয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব অধিক। এ জাতীয় ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। নিচে কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. যৌথমূলধনি কোম্পানি একটি আইনসৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন। দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইনের আওতায় এ ব্যবসায় গঠিত হয়। আইনি প্রক্রিয়ার অধীনে হয় বলে এর গঠন বেশ জটিল ও আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। আইন অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সদস্য ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

২. কোম্পানি ব্যবসায় একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানি ব্যবসায় করতে আগ্রহী কিছুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে কোম্পানি গঠন করে। তবে সদস্যদের কেউ ইচ্ছা করলে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে সহজেই ব্যবসায় থেকে বিদায় নিতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এর সদস্য পদও লাভ করতে পারে।

৩. আইনের দ্বারা সৃষ্ট বলে এ ব্যবসায়টি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে বোঝায়, ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির ন্যায় আইনগত মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করা। কোম্পানি যেকোনো স্বাধীন ব্যক্তির মতো নিজ নামে অন্যের সাথে চুক্তি ও লেনদেন করতে পারে এবং প্রয়োজনে মামলাও করতে পারে। আবার অন্য কোনো পক্ষও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

৪. কোম্পানি ব্যবসায় যেহেতু আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট তাই এর বিলুপ্তি ঘটাতে চাইলে তা করতে হবে আইনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায়। এভাবে সে চিরন্তন অস্তিত্বের মর্যাদা লাভ করে। কোনো শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব বা শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে কোম্পানির বিলোপ সাধন হয় না।

৫. কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়ার কারণে কোম্পানিকে একটি সিল ব্যবহার করতে হয়। কোম্পানির সকল কাজে ও কাগজপত্রে এ সিলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

৬. আইনগতভাবেই কোম্পানির মূলধনকে কতকগুলো সমান অঙ্কের ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হয়। এরূপ প্রত্যেকটি একককে একটি করে শেয়ার বলে। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করে। এজন্য এগুলোকে শেয়ার মূলধন বলে। ১৮ বছরের উর্ধ্বে যেকোনো ব্যক্তি এবং যেকোনো প্রতিষ্ঠান শেয়ার কিনে এর সদস্যপদ লাভ করতে পারে। সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এবং শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করার সুযোগ থাকার কারণে কোম্পানি ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের সমাবেশ ঘটে।

৭. কোম্পানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ আলাদা। একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের মতো মালিকেরা সরাসরি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে না। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে বেতনভুক্ত অন্য একটি পক্ষের উপর। পরিচালক বা মালিকগণ নীতিনির্ধারণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৮. কোম্পানি ব্যবসায়ের সদস্যগণের দায় সীমিত। একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের মতো অসীম নয়। সদস্যগণের দায় সাধারণত শেয়ার মূল্য ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ বলতে বোঝায় একজন শেয়ার মালিক যে মূল্যমানের শেয়ার কেনে, তিনি শুধু সে পরিমাণ অর্থের জন্য দায়ী। অর্থাৎ যদি কোনো শেয়ার মালিক কোনো কোম্পানির ১০০ টাকা মূল্যের ১০০টি শেয়ার ক্রয় করেন, তাহলে তার দায় শুধু ১০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিতে একজন শেয়ারমালিক যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন সে পরিমাণ অর্থের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

৯. কোম্পানি ব্যবসায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। শেয়ারমালিকগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে পরিচালনা পরিষদ নিয়োগ করেন এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবসায় পরিচালিত হয়।

কর্মপত্র-১ : যৌথমূলধনি ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করো	
কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা	কোম্পানি সংগঠনের অসুবিধা
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

যৌথমূলধনি ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ (Classification of Join Stock Company)

বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক দিকের বহুবিধ পরিবর্তন ও উন্নয়নের ছোঁয়া ব্যবসায় জগৎকে স্পর্শ করে। যার কারণে একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে বৃহদায়তন ব্যবসায় হিসেবে যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। যৌথ মালিকানাধীন যত রকমের ব্যবসায় সংগঠন আছে তার মধ্যে কোম্পানি সংগঠন সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাংলাদেশের কোম্পানি সংগঠনগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (Private Limited Company)

যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জনে সীমাবদ্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য, নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে বলা হয়েছে, 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে এমন কোম্পানিকে বোঝায়, যার সদস্য সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ, সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তর অধিকার সীমিত এবং শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য জনগণের নিকট আমন্ত্রণ জানানো নিষিদ্ধ' অর্থাৎ কোম্পানির সদস্যগণ শুধু নিজেরাই শেয়ার ক্রয় করতে পারেন। সদস্য সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ সীমিত হওয়ার কারণে এ জাতীয় কোম্পানির আয়তন তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। আইন অনুযায়ী এ কোম্পানির পরিচালকের সংখ্যা ন্যূনতম ২ হতে হবে। বাংলাদেশে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public Limited Company)

যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কোম্পানির স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শেয়ার ও ঋণপত্র জনগণের নিকট বিক্রি করা যায় এবং শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রয়োজনে স্মারকলিপিতে সংশোধনী এনে শেয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। আইন অনুযায়ী এ কোম্পানির ন্যূনতম ৩ জন পরিচালক থাকতে হবে।

কর্মপত্র–২ : প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে ৫টি পার্থক্য বের করো	
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের গুরুত্ব (Importance of Joint Stock Company)

বর্তমান ব্যবসায় জগতে একমালিকানা ব্যবসায়ের মতো যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ব্যবসায়ও দেশে দেশে খুব জনপ্রিয়। তাছাড়া বৃহদায়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কোম্পানি সংগঠন সবচেয়ে বেশি উপযোগী। কর্মসংস্থানের সাথে সাথে শুধু বেকারত্বই দূর হয় না, জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়ে। আবার একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ে ঝুঁকি এবং দায় অসীম হওয়ার কারণে বড় আকারের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ সম্ভব হয় না, যা সম্ভব হয় কোম্পানি সংগঠনে। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে কোম্পানি সংগঠনই বেশি উপযুক্ত। কারণ এ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন ও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিশাল পরিমাণ মূলধন ও অর্থের প্রয়োজন হয় তা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো জনগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে পারে। ফলে দেশের শিল্প উন্নয়ন বিকাশে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। কোম্পানি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পায় ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও সুদৃঢ় হয়। বর্তমানে বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি বিশ্বব্যাপী তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করে। আমাদের দেশেও বাটা সু লিমিটেড, ইউনিলিভার ইত্যাদি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এভাবে এক দেশের কোম্পানি অন্য দেশে শাখা খুলে কাজ করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে বিগত দুই দশক যাবৎ অনেকগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

কর্মপত্র–৩

বাংলাদেশে কর্মরত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা তৈরি করো	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের গুরুত্ব চিহ্নিত করো
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া (Process of Formation of a Company)

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে কতকগুলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোম্পানি গঠন করতে হয়। কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়াটি সাধারণত চারটি ধারাবাহিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হলো–

ক. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানি গঠনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিজেরা একত্রিত হয়ে কোম্পানির সম্ভাব্য নাম, কোম্পানির ধরন, মূলধনের পরিমাণ, মূলধন সংগ্রহের উপায়, কোম্পানির ঠিকানা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় সংগঠনের সম্ভাব্য নাম স্থির করে নিবন্ধকের অফিস থেকে সে নামে ছাড়পত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন ।

খ. দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানি ব্যবসায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়ন করেন। একটি হলো স্মারকলিপি এবং অন্যটি হলো পরিমেল নিয়মাবলি। স্মারকলিপিকে কোম্পানির মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান বলা হয়। এতে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- কোম্পানির নাম, নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারমালিকদের দায়দায়িত্ব, ন্যূনতম চাঁদা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

গ. নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের অফিস থেকে ফি দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফি ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। নিবন্ধক নির্ধারিত আবেদনপত্র, সকল দলিলপত্র ও ফি পাওয়ার পর যদি সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হন, তবে নিবন্ধন বইতে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং নিবন্ধনপত্র প্রদান করেন। এ পত্র পাওয়ার পর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে, তবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

ঘ. কার্যারম্ভ পর্যায়

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য ন্যূনতম চাঁদা (Minimum Subscription) সংগ্রহের ঘোষণাপত্র এবং জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসহ আবেদন করতে হয়। সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে এবং নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান করেন। এ পত্র পাওয়ার পরেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

কর্মপত্র-৪ : ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বহুজাতিক কোম্পানির গঠন, লক্ষ্য, কার্যাবলি, মুনাফা, কর্মসংস্থানের অবস্থা ও সামাজিক দায়াবদ্ধতার দিকগুলোর উপর দলীয়ভাবে একটি পেজেন্টেশন তৈরি করো।

সমবায় সমিতির ধারণা (Concept of Cooperative Society)

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হলো সম্মিলিত উদ্যোগে বা প্রচেষ্টায় কাজ করা। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও চিন্তা থেকেই সমবায়ের উৎপত্তি। শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠনের

বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত যত মজবুত হতে থাকে, এর প্রভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দেখা দিতে থাকে। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে দূরবস্থার সম্মুখীন হতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজের সৃষ্ট এ জাতীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দূরবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠে। সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানে। তবে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রপথিক সংগঠন হচ্ছে ১৮৪৪ সালে উত্তর ইংল্যান্ডের রচডেল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত রচডেল সমবায় সমিতি (Rochdale Equitable Pioneers Society)। ২৮ জন তাঁত শ্রমিকের ২৮ স্টার্লিং পাউন্ড পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ সমবায় সমিতিকে বিশ্বের সর্বপ্রথম সমবায় ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমিতির সদস্যদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তারা তাদের স্বল্প বেতন দিয়ে উচ্চমূল্যের খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে সক্ষম ছিল না। সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ময়দা, চিনি জাতীয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে কম দামে নিজেদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

বিশ্বের সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি রচডেল সমিতি 'The Rochdale Pioneers Equitable Society' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের রচডেল নামক স্থানে ।

নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতা, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সততাকে তারা এ ব্যবসায় পরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়।

আমাদের এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯০৪ সালে সরকারিভাবে সমবায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯১৮ সালে কলকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ড. আক্তার হামিদ খানের নেতৃত্বে কুমিল্লায় পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (BARD) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায় সমিতি আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতীয় সমবায়

ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের সমবায় সংগঠন 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি.' যা 'মিল্ক ভিটা' নামে পরিচিত। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., বাংলাদেশ অটোরিক্সাচালক সমবায় ফেডারেশন লি., কুমিল্লা শিল্প সমবায় সমিতি বাংলাদেশ লি., জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডসহ অনেক সমবায় সমিতি কাজ করছে। সমবায় অধিদপ্তরের ২০২৪ সালের হিসেব মতে, বাংলাদেশে ১,৮২,০৭১টি সমবায় সমিতি রয়েছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৯৫,৬১,৯৪৪ জন। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সমবায় সমিতি ২০০১ সালের সমবায় আইন এবং ২০০৪ সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল ও উন্নত বিভিন্ন দেশে সমবায় একটি জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশে সমবায়ের শতবর্ষের স্মারক খাম

সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cooperative Organization)

সাধারণভাবে কতিপয় নিম্ন ও মধ্যবিত্তের সমমনা ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা সমতার ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে, গণতান্ত্রিকভাবে উক্ত সংগঠনটি পরিচালনা করে এবং ন্যায়সংগতভাবে উক্ত সংগঠনের ঝুঁকি ও সুযোগ-সুবিধা ভাগ করে নিতে সম্মত হয়। সমবায় সমিতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. সাধারণত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সমমনা ও পেশার ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছামূলকভাবে এ জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলে। সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, মুনাফা অর্জন নয়।

২. ২০০১ সমবায় আইনে তিন ধরনের সমবায় সমিতির উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো–

(ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি, যার সদস্য সংখ্যা হবে ন্যূনতম ২০ জন একক ব্যক্তি এবং যার উদ্দেশ্য হবে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সর্বাধিক সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে অন্তত ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উদ্দেশ্য হবে উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

(গ) জাতীয় সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে ১০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, এবং উদ্দেশ্য হবে দেশব্যাপী উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

৩. সমবায় সমিতি সমবায় আইনে গঠিত একটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে, উদ্দেশ্য পূরণে যেকোনো ধরনের সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর করার এবং চুক্তি করার অধিকার থাকবে। সমিতির একটি সাধারণ সিলমোহর থাকবে এবং নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং সমিতির নামেও অন্য কেউ মামলা দায়ের করতে পারবে।

৪. সমবায় সমিতির মূলধন সমমূল্যের কতকগুলো শেয়ারে বিভক্ত থাকে। সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য অন্তত একটি শেয়ার ক্রয় করে সমিতির সদস্য হতে পারবেন তবে, কোনো সদস্য সমিতির মোট শেয়ার মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে না। সদস্যগণের দায় সাধারণত সীমিত ও শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৫. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সকল স্তরে সমবায় সমিতিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। সকল শ্রেণির সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটিমাত্র ভোট প্রয়োগের অধিকারী। উক্ত ভোট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে প্রয়োগ করতে হয়, প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনো ভোট দেওয়া যায় না।

৬. সমবায় আইন ২০০১ অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি তার নামের অংশ হিসেবে সমবায় বা Cooperative শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। অর্থাৎ নিবন্ধন ব্যতীত 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অন্যান্য কারবারের সাথে সমবায়ের বেশ মিল থাকলেও কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

সমবায় সমিতির প্রকারভেদ (Classification of Cooperative Society)

সমবায় মূলত স্বল্পবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন লোকদের সংগঠন। যদিও বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বনির্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করছে। তবে সমবায় বিধিমালা ২০০৪-এ পেশাভিত্তিক নিম্নোক্ত সমবায় সমিতিসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে–

১. কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি

২. মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি

৩. শ্রমজীবী সমবায় সমিতি

৪. মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি

৫. তাঁতি সমবায় সমিতি

৭. ভূমিহীন সমবায় সমিতি (সদস্যগণের সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ হবে ৪০ শতক)

৭. বিত্তহীন সমবায় সমিতি

৮. মহিলা সমবায় সমিতি

৯. অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, ট্যাক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক, ট্যাঙ্ক-লরি চালক সমবায় সমিতি

১০. হকার্স সমবায় সমিতি

১১. পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায় সমিতি

১২. কর্মচারী সমবায় সমিতি

১৩. দুগ্ধ সমবায় সমিতি

১৪. মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি

১৫. যুব সমবায় সমিতি (১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সী যুব ও যুব-মহিলাদের জন্য)

১৮. গৃহায়ন (হাউজিং) সমবায় সমিতি

১৯. ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি

২০. দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি

সকল ধরনের সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। তবে স্বল্পবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য সমবায়ের উদ্ভব হলেও বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বিত্তশালী ব্যক্তিও সমবায় সমিতি গঠন করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে আশা করা যায় যে, স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছুক দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক সমবায় সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সমবায় সমিতির গঠন প্রক্রিয়া (Formation Process of Cooperative Society)

আইনের মাধ্যমে গঠিত বলে আইনগত নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে সমিতি গঠন ও পরিচালনা করতে হয়। বাংলাদেশে ২০০১ সালের সমবায় আইনে সমবায় সংগঠন গঠন করতে চাইলে তিনটি পর্যায়ে সমবায় সমিতির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ক. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় : প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করতে চাইলে সমমনা, সমশ্রেণি, সমপেশা ও সমমর্যাদার প্রাপ্তবয়স্ক ন্যূনতম ২০ জন মানুষ স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এ সকল উদ্যোক্তা নিজেদের মধ্য থেকে ৬ জনকে নিয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি নিবন্ধনসহ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য একটি উপবিধি তৈরি করে। উপবিধিতে সমবায় সমিতির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধনের পূর্ণ বিবরণ, শেয়ারের মূল্যমান ও সংখ্যা, শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবি এবং সমিতি পরিচালনার নিয়ম উল্লেখ থাকে। সমিতির জন্য একটি সিলমোহরও তৈরি করতে হয়। সমিতি সসীম দায়বিশিষ্ট হলে নামের শেষে লি. কথাটি লিখতে হয়।

খ. নিবন্ধন পর্যায় : এ পর্যায়ে নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সমিতিটি যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকায় সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধকের অফিস থেকে নিবন্ধনের আবেদন ফরম–১ সংগ্রহ করে, যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফিসহ প্রস্তাবিত উপ-আইনের ৩ (তিন) কপিসহ নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। সরকারি কর্মসূচির আওতায় বিত্তহীন, ভূমিহীন এবং আশ্রয়হীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার ট্রেজারি চালান, অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৩০০ (তিন শত) টাকার ট্রেজারি চালান, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

নিবন্ধনের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকার ট্রেজারি চালান এবং জাতীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধনের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারি চালান আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হয়। নিবন্ধনের জন্য বিভিন্ন সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় বা সরকারি কর্মসূচির আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি ব্যতীত অন্যান্য প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকার এবং কেন্দ্রীয় সমিতি ও জাতীয় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধিত শেয়ার মূলধন থাকতে হবে। আবেদনপত্রটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাগজপত্র ও নিয়মাবলিসহ সকল বিষয় সঠিকভাবে পাওয়া গেলে নিবন্ধক সমবায় সমিতির নাম তার নিবন্ধন বইতে তালিকাভুক্ত করেন এবং সমিতিকে সিলযুক্ত দুই কপি উপবিধি ও নিবন্ধন নম্বর প্রদান করেন। এভাবে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গ. **কার্যারম্ভ পর্যায়** : নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর সমবায় সমিতি আইনগতভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। নিবন্ধিত না হলে কোনো সংগঠন সমবায় কথাটি ব্যবহার করতে পারে না। নিবন্ধন প্রাপ্তির পর উক্ত সমিতির উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করতে পারে।

কর্মপত্র–৫ : একমালিকানা, অংশীদারি ও যৌথমূলধনি ব্যবসায়ের সাথে সমবায় সমিতির মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করো	
মিল	অমিল
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

সমবায় সমিতির মূলনীতি (Basic Principles of Cooperative Society)

অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে ভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠে। সাধারণত সমশ্রেণি ও সমপেশাভুক্ত নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন সমাজের মানুষেরা প্রথমত নিজেদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলে। নিচে সমবায়ের নীতিগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. সমবায়ের প্রধান নীতিই হচ্ছে সমমনা, সমপেশা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমশ্রেণির লোকদের একতা। মূলত একতাই বল (Unity is strength) নীতির ভিত্তিতে এ ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়েছে।

২. সমবায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সাম্য বা সকলের সমান অবস্থান ও অংশগ্রহণ। এর সদস্যগণ অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে যেমনই হোক না কেন সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী।

৩. সমবায়ের আরেকটি নীতি ও মূল্যবোধ হলো সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা। সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও সহানুভূতি সমবায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সমবায়ের সাফল্যের চাবিকাঠি।

৪. সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সমবায়ের সাফল্যের আরেককটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস তাদেরকে উদ্যমী, আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

৫. সমবায়ের আরেকটি মৌলিক আদর্শ হলো এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা। সমবায় সমিতিতে সকলের ভোট প্রয়োগের অধিকার আছে এবং প্রত্যেকের একটি ভোট থাকে। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ সদস্যদের মধ্যে কমবেশি থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ ও মতামত প্রকাশে সকলের সমান সুযোগ আছে।

বাংলাদেশে সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা (Problems and Prospects of Cooperative Society in Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, এখনও এ দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ কৃষি ও গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন পেশায় যেমন– কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, মৎস চাষি, কামার, কুমার, জেলে ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, ঝিনুক শিল্প, হস্তশিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের একমালিকানা ব্যবসায় যেমন- মুদি দোকান, দরজি দোকান, ওষুধ বিক্রির দোকান, সবজি বিক্রির দোকান, সেলুন, চা বিক্রির দোকান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অথচ তাদের বেশির ভাগই স্বল্প ও নিম্ন আয়ের। ফলে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তাদের একার পক্ষে নিজেদের উন্নতি করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতি, মূলধনের স্বল্পতা, উন্নত সার, বীজ ও কীটনাশকের অভাব, খণ্ড খণ্ড কৃষি জমি ইত্যাদি কারণে এ দেশের অর্থনীতির প্রাণ কৃষক ও কৃষি তাদের যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। আবার নিজেদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা ও আস্থা না থাকার কারণে বিভিন্ন দালাল শ্রেণির লোকদের দ্বারা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এ সকল স্বল্প ও নিম্নবিত্তের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে সমবায় সংগঠন। সমমনা ও সমশ্রেণির ঐ সকল গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অনেক সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখছে। কিন্তু দেশের এবং সমাজের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে সকলকে বিশেষ করে যুবসমাজকে সমবায়ের দিকে উৎসাহিত করতে হবে।

কর্মপত্র–৬

তোমাদের এলাকার কৃষকদেরকে সমবায় সংগঠন করার জন্য তোমরা কীভাবে উৎসাহিত করতে পারো?	পড়াশোনা শেষ করে তুমি কীভাবে নিজেকে সমবায় সংগঠন করতে উৎসাহিত করবে?
• • • • • •	• • • • • •

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of the State enterprise)

সাধারণ অর্থে সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার ব্যক্তিমালিকানাধীন যেকোনো ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করতে পারে। সাধারণত দেশে অধিক শিল্পায়ন, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ কিছু জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র নির্মাণ শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় বেশ কিছু ব্যবসায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Charecteristic of the State Enterprise)

অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানের অধ্যাদেশ বা জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। তাছাড়া সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের মাধ্যমেও এরূপ ব্যবসায় গঠন করা যায়।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকে ও সকল মূলধন সরকারই সরবরাহ করে থাকে। তবে সরকার কোনো কোনো অবস্থায় জনগণের নিকট আংশিক শেয়ার বিক্রি করতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন জোগানদাতা সরকার ও জনগণ।
- বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় বলে এ জাতীয় ব্যবসায় কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী।
- অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো মুনাফা অর্জন বা বৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। জনসেবা বা জনকল্যাণই এ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ে লাভ হলে তা সরকারি তহবিলে জমা হয় এবং জনকল্যাণে ব্যয় হয়। আবার লোকসান হলে তা সরকারকেই বহন করতে হয়।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য সরকারকে জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

কর্মপত্র–৭ : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করো
•   •   •   •   •   •   •   •   •

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (State Enterprises of Bangladesh)

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর নতুন সরকার জনকল্যাণমুখী, সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক, আর্থিক ও বিমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলেও এখনও অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের নাম, ধরন ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের নাম একটি তালিকায় দেওয়া হলো–

বাংলাদেশ ব্যাংক

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের নাম	ব্যবসায়ের ধরন	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নাম
• বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ পাটকল শিল্প সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সেবা শিল্প	জ্বালানি ও খনিজ
• বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যাংকিং	অর্থ
• বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ রেলওয়ে	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা	সেবা	বিমান ও পর্যটন
• বাংলাদেশ বিমান	পরিবহন	বিমান ও পর্যটন
• বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ সংস্থা	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা	সেবা	টেলিযোগাযোগ
• বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, গাজীপুর	শিল্প	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
• বাংলাদেশ টেলিভিশন	সেবা	তথ্য
• বাংলাদেশ বেতার	সেবা	তথ্য
• তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	সেবা	জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়
• জীবন বিমা কর্পোরেশন	জীবন বিমা	অর্থ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় সংগঠন কোনটি?

ক. অংশীদারি খ. একমালিকানা

গ. সমবায় ঘ. যৌথমূলধনি

২। অংশীদারি ব্যবসায়ে কখন আস্থা সংকট দেখা দেয়?

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হলে খ. চুক্তি লিখিত না হলে

গ. মুনাফা কম হলে ঘ. পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রসুলপুর গ্রামের দরিদ্র গৃহবধূরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। স্থানীয় এনজিও থেকে কিছু ঋণ নিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরি করে শহরে বিক্রয় করেন। একদিন তাদেরই একজন সদস্য শহরে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়লে সম্পূর্ণ পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে সকলে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে তাদের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখেন।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতিটি কোন সমিতির অন্তর্ভুক্ত?

ক. বিত্তহীন খ. ভূমিহীন

গ. ব্যবসায়ী ঘ. কৃষি

৪। উল্লিখিত সমিতিটি সফল হওয়ার কারণ–

i. পারস্পরিক আস্থা

ii. সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব

iii. গণতান্ত্রিক মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিম্নবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান আবির যখন এসএসসি পাস করে সে সময়ে হঠাৎ তার বাবা মারা যায়। ফলে সংসারের দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। এতে তার লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। ফলশ্রুতিতে আবির কিছু টাকা ধার করে কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ছোট একটি চায়ের দোকান খুলে কর্মজীবন শুরু করেন।

ক. একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

খ. একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের ১টি পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

গ. আবিরের ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কেমন হবে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সাংগঠনিক ধরন বিবেচনায় আবিরের ব্যবসায়টি 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' অথচ অসীম দায়সম্পন্ন– উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

২। নাফিজ ও তার চার বন্ধু চুক্তির ভিত্তিতে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে সমস্যা হচ্ছে। তাই তারা সংগঠনের ধরন পরিবর্তন করে ১৯৯৪ সালের আইনানুযায়ী 'নাফিজ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' কোং লি. নামে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন করে বৃহৎ পরিসরে কাজ শুরু করেন। ২ বছরের মধ্যে তারা দুইটি বিভাগীয় শহরে তাদের শাখা খুলে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন।

ক. ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার?

খ. একমালিকানা ব্যবসায় 'মালিকের দায় অসীম' কথাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. নাফিজ ও তার বন্ধুদের ১ম পর্যায়ের ব্যবসায় সংগঠনটি কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সাংগঠনিক ধরন পরিবর্তন করায় নাফিজদের প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনীতিতে আরও বেশি ভূমিকা রাখবে– বিষয়টি মূল্যায়ন করো।